আল জিন

৭২

নামকরণ

আল জিন এ সূরার নাম। এর বিষয়বস্তুর শিরোনামও আল জিন। কারণ এতে কুরআন শুনে জিনদের নিজেদের জাতির কাছে যাওয়া এবং তাদের মধ্যে ইসলামের তাবলীগ ও দাওয়াতের কাজ করার ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

বুখারী ও মুসলিম হাদীস গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়েকজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে উকাযের বাজারে যাচ্ছিলেন। পথে নাখলা নামক স্থানে তিনি ফজরের নামাযে ইমামতি করেন। সে সময় একদল জিন ঐ স্থান অতিক্রম করছিলো। কুরআন তিলাওয়াতের শব্দ শুনে তারা সেখানে থেমে যায় এবং গভীর মনযোগসহ কুরআন শুনতে থাকে। এ সূরাতে এ ঘটনারই উল্লেখ করা হয়েছে।

এ বর্ণনার ভিত্তিতে অধিকাংশ মুফাস্‌সির মনে করেছেন যে, এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইতিহাস খ্যাত তায়েফ সফরের ঘটনা। ঘটনাটি ঘটেছিল হিজরাতের তিন বছর আগে নবুওয়াতের ১০ম বছরে। কিন্তু কয়েকটি কারণে এ ধারণা ঠিক নয়। তায়েফের উক্ত সফরে জিনদের কুরআন শোনার যে ঘটনা ঘটেছিল তা সূরা আহকাফের ২৯ থেকে ৩২ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। ঐ আয়াতগুলো একবার দেখলেই বুঝা যায়, সে সময় যেসব জিন কুরআন শুনে তার প্রতি ঈমান এনেছিল তারা আগে থেকেই হযরত মূসা এবং পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান পোষণ করতো। পক্ষান্তরে এ সূরার ২ হতে ৭ পর্যন্ত আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এ সময় যে জিনেরা কুরআন শুনেছিল তারা ছিল মুশরিক। তারা আখেরাত ও রিসালাত অস্বীকার করতো। তাছাড়াও এ বিষয়টি ইতিহাস থেকে প্রমাণিত যে, তায়েফের সফরে যায়েদ ইবনে হারেসা ছাড়া আর কেউ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলেন না। পক্ষান্তরে এ সূরায় উল্লেখিত সফর সম্পর্কে ইবনে আব্বাস বর্ণনা করছেন যে, এ সময় কয়েকজন সাহাবী তাঁর সাথে ছিলেন। তা ছাড়াও অনেকগুলো বর্ণনা এ বিষয়ে একমত যে, সূরা আহ্‌কাফে বর্ণিত ঘটনায় জিনরা যখন কুরআন শুনেছিল তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তায়েফ থেকে মক্কা ফেরার পথে নাখলায় অবস্থান করছিলেন। আর ইবনে আব্বাসের বর্ণনা মতে এ সূরায় বর্ণিত সফরে জিনদের কুরআন শোনার ঘটনা তখন ঘটেছিল যখন তিনি মক্কা থেকে উকায যাচ্ছিলেন। এসব কারণে যে বিষয়টি সঠিক বলে জানা যায় তাহলো, সূরা আহ্‌কাফ

এবং সূরা জিনে একই ঘটনার উল্লেখ করা হয়নি। বরং এ ছিল ভিন্ন ভিন্ন সফরে সংঘটিত ভিন্ন ভিন্ন দু'টি ঘটনা।

সূরা আহ্‌কাফে যে ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে তা যে দশম নববী সনে তায়েফ সফরের সময় সংঘটিত হয়েছিল সে ব্যাপারে রেওয়ায়াতসমূহে ঐকমত্য পোষণ করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো, এ দ্বিতীয় ঘটনাটি কখন সংঘটিত হয়েছিল? ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় এর কোন জবাব পাওয়া যায় না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদল সাহাবীকে সাথে নিয়ে কখন উকাযের বাজারে গিয়েছিলেন অন্য আর কোন ঐতিহাসিক বর্ণনা থেকেও তা জানা যায় না। তবে এ সূরার ৮ থেকে ১০ পর্যন্ত আয়াতগুলো সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করলে বুঝা যায়, এটি নবুওয়াতের প্রাথমিক যুগের ঘটনা হবে। এসব আয়াতে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতলাভের পূর্বে জিনরা উর্ধ জগতের খবর জানার জন্য আসমান থেকে কিছু না কিছু শুনে নেয়ার একটা সুযোগ পেয়ে যেতো। কিন্তু এরপর তারা হঠাৎ দেখতে পেলো সবখানে ফেরেশতাদের কড়া পাহারা বসে গেছে এবং উল্কার বৃষ্টি হচ্ছে। তাই কোথাও তারা এমন একটু জায়গা পাচ্ছে না যেখানে অবস্থান নিয়ে কোন আভাস তারা লাভ করতে পারে। তাই একথা জানার জন্য তারা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো যে, পৃথিবীতে এমন কি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বা হতে যাচ্ছে যার জন্য এ কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। সম্ভবত তখন থেকেই জিনদের বিভিন্ন দল বিষয়টির অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছিল এবং তাদেরই একটি দল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র মুখ থেকে কুরআন মজীদের তিলাওয়াত শুনে এ সিদ্ধান্তে পৌছেছিল যে, এটিই সে বস্তু, যার কারণে জিনদের জন্য উর্ধ জগতের সমস্ত দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

জিনদের হাকীকত বা তাৎপর্য

মন-মগজ যাতে কোন প্রকার বিভ্রান্তির শিকার না হয় সে জন্য এ সূরা অধ্যয়নের আগে জিনদের তাৎপর্য সম্পর্কে জেনে নেয়া আবশ্যক। বর্তমান যুগের বহু লোক এ ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত আছে যে, জিন বলতে বাস্তবে কিছু নেই। বরং এটিও প্রাচীন কালের কুসংস্কার ভিত্তিক বাজে একটি ধারণা। তাদের এ ধারণার ভিত্তি কিন্তু এটা নয় যে, তারা গোটা বিশ্ব-জাহানের সবকিছুর তাৎপর্য ও বাস্তবতা জেনে ফেলেছে এবং এও জেনে ফেলেছে যে, জিন বলে কোথাও কিছু নেই। এমন জ্ঞান লাভের দাবী তারা নিজেরাও করতে পারে না। কিন্তু কোন প্রমাণ ছাড়াই তারা ধরে নিয়েছে যে, গোটা বিশ্ব-জাহানে শুধু তা-ই বাস্তব যা অনুভব করা যায় বা ধরা ছোঁয়ার মধ্যে আনা যায়। অথচ সমুদ্রের তুলনায় এক বিন্দু পানির যে অবস্থা এ বিরাট বিশাল বিশ্ব-জাহানের বিশালত্বের তুলনায় মানুষের অনুভূতি ও ধরা-ছোঁয়ার গণ্ডির অবস্থা তাও নয়। যে ব্যক্তি মনে করে যে, যা অনুভব করা যায় না তার কোন অস্তিত্ব নেই, আর যার অস্তিত্ব আছে তা অবশ্যই অনুভূত হবে, সে আসলে নিজের বুদ্ধি-বিবেকের সংকীর্ণতারই প্রমাণ দেয়। এ ধরনের চিন্তাধারা অবলম্বন করলে শুধু এক জিন নয় বরং এমন কোন সত্যকেই মানুষ মেনে নিতে পারবে না যা

সরাসরি তার অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণে ধরা পড়ে না এবং অনুভব করা যায় না এমন কোন সত্যকে মেনে নেয়া তো দূরের কথা আল্লাহর অস্তিত্ব পর্যন্তও তাদের কাছে মেনে নেয়ার মত থাকে না।

মুসলমানদের মধ্যে যারা এরূপ ধ্যান–ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে কিন্তু কুরআনকেও অস্বীকার করতে পারেনি তারা জিন, ইবলীস এবং শয়তান সম্পর্কে কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্যকে নানা রকম ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণের বিষয়ে পরিণত করেছে। তারা বলেন ঃ জিন বলতে এমন কোন অদৃশ্য মাখলুক বুঝায় না যাদের স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব আছে। বরং কোথাও এর অর্থ মানুষের পাশবিক শক্তি যাকে শয়তান বলে অভিহিত করা হয়েছে। কোথাও এর অর্থ অসভ্য, বন্য ও পাহাড়ী এলাকায় বসবাসকারী জাতিসমূহ। আবার কোথাও এর দ্বারা ঐ সব লোকদের বুঝানো হয়েছে যারা গোপনে কুরআন শুনতো। কিন্তু এ ব্যাপারে কুরআন মজীদের বক্তব্য এত স্পষ্ট ও খোলামেলা যে, এ ধরনের ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণের সামান্যতম অবকাশও তাতে নেই।

কুরআন মজীদে এক জায়গায় নয় বহু জায়গায় এমনভাবে জিন ও মানুষের উল্লেখ করা হয়েছে যা থেকে বুঝা যায়, এরা স্বতন্ত্র দু'টি মাখলুক। উদাহরণ স্বরূপ দেখুন সূরা আ'রাফ, আয়াত ৩৮; হূদ, ১৯; হা–মীম আস সাজদা, আয়াত ২৫ ও ২৯; আল আহকাফ ১৮; আয যারিয়াত; ৫৬ এবং আন নাস, ৬। সূরা আর রাহমান তো পুরাটাই এ ব্যাপারে এমন অকাট্য প্রমাণ যে, জিনদের এক প্রকার মানুষ মনে করার কোন অবকাশই নেই। সূরা আ'রাফের ১২ আয়াত, সূরা হিজরের ২৬ ও ২৭ আয়াত এবং সূরা আর রাহমানের ১৪ ও ১৫ আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, মানুষ সৃষ্টির মৌলিক উপাদান হলো মাটি আর জিন সৃষ্টির মৌলিক উপাদান হলো আগুন।

সূরা হিজরের ২৭ আয়াতে পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়েছে যে, মানুষ সৃষ্টির পূর্বে জিনদের সৃষ্টি করা হয়েছে। কুরআন মজীদের সাতটি স্থানে আদম ও ইবলীসের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। এর সবগুলো স্থানের বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানুষের সৃষ্টির সময় ইবলীস বর্তমান ছিল। এ ছাড়াও সূরা কাহ্ফের ৫০ আয়াতে বলা হয়েছে যে, ইবলীস জিনদেরই একজন।

সূরা আ'রাফের ২৭ আয়াতে পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়েছে যে, জিনরা মানুষকে দেখতে পায় কিন্তু মানুষ জিনদের দেখতে পায় না।

সূরা হিজরের ১৭ থেকে ১৮, সূরা সাফ্ফাতের ৬ থেকে ১০ এবং সূরা মূলকের ৫ আয়াতে বলা হয়েছে, জিনেরা উর্ধ জগতের দিকে উঠতে সক্ষম হলেও একটি নির্দিষ্ট সীমার ওপরে তারা যেতে পারে না। এর উর্ধে যাওয়ার চেষ্টা করলে এবং উর্ধজগতে বিচরণকারী ফেরেশতাদের কথাবার্তা শুনতে চাইলে তাদের থামিয়ে দেয়া হয়। গোপনে দৃষ্টির অগোচরে শুনতে চাইলে উল্কাপিণ্ড ছুড়ে মেরে তাড়িয়ে দেয়া হয়। একথার মাধ্যমে আরবের মুশরিকদের একটি ধারণার প্রতিবাদ করা হয়েছে। তাদের ধারণা ছিল জিনরা গায়েবী বিষয়ের খবর জানে অথবা খোদায়ীর গোপন তত্ত্বসমূহ জানার কোন উপায় তাদের জানা আছে। সূরা সাবার ১৪ আয়াতেও এ ভ্রান্ত ধারণা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

সূরা বাকারার ৩০ থেকে ৩৪ আয়াত এবং সূরা কাহ্‌ফের ৫০ আয়াত থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর খেলাফত দিয়েছেন মানুষকে। এও জানা যায় যে, মানুষ জিনদের চেয়ে উত্তম মাখলুক যদিও জিনদের কিছু অস্বাভাবিক ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। আমরা সূরা নাম্‌লের ৭ আয়াতে এর একটি দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। কিন্তু মানুষের তুলনায় পশুরাও কিছু অধিক ক্ষমতা লাভ করেছে। কিন্তু এর দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, পশুরা মানুষের চেয়ে অধিক মর্যাদার অধিকারী।

কুরআন একথাও বলে যে, জিনরাও মানুষের মত একটি মাখলুক। তাদেরকেও মানুষের মত স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। ইবলীসের কাহিনী এবং সূরা আহ্‌কাফ ও সূরা জিনে উল্লেখিত কিছু সংখ্যক জিনের ঈমান আনার ঘটনা এর সুস্পষ্ট প্রমাণ।

কুরআনের বহু জায়গায় এ সত্যটিও বর্ণনা করা হয়েছে যে, আদমকে সৃষ্টি করার মুহূর্তেই ইবলীস এ মর্মে দৃঢ় সংকল্প করেছিল যে, সে মানব জাতিকে গোমরাহ, বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। সে সময় থেকেই জিনদের শয়তানরা মানুষকে গোমরাহীর মধ্যে ঠেলে দেয়ার চেষ্টায় লেগে আছে। কিন্তু মানুষের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে জবরদস্তিমূলকভাবে কোন কাজ করিয়ে নেয়ার সামর্থ তারা রাখে না। বরং তারা তা মনের মধ্যে সন্দেহ–সংশয় সৃষ্টি করে, তাদের বিভ্রান্ত করে এবং অন্যায় ও গোমরাহীকে তাদের সামনে শোভনীয় করে পেশ করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্ন বর্ণিত আয়াতগুলো পাঠ করুন। সূরা নিসা, আয়াত ১১৭ থেকে ১২০; আ'রাফ, ১১ থেকে ১৭ পর্যন্ত; ইবরাহীম ২২; আল হিজ্‌র ৩০ থেকে ৪২; আন নাহল, ৯৮ থেকে ১০০ এবং বনী ইসরাঈল, ৬১ থেকে ৬৫ আয়াত পর্যন্ত।

কুরআন শরীফে একথাও বলা হয়েছে যে, আরবের মুশরিকরা জাহেলী যুগে জিনদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করতো, তাদের ইবাদাত বা পূজা–অর্চনা করতো এবং তাদেরকে আল্লাহর বংশধর বা সন্তান–সন্ততি মনে করতো। দেখুন, সূরা আল আন'আম, আয়াত ১০০; সাবা, আয়াত ৪০ থেকে ৪১ এবং আস্‌ সাফ্‌ফাত, আয়াত ১৫৮।

এসব বিশদ আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, জিনরা একটা স্বতন্ত্র বহিঃসত্তার অধিকারী এবং তারা মানুষের থেকে ভিন্ন প্রজাতির আরেকটি অদৃশ্য সৃষ্টি। তাদের রহস্যজনক গুণাবলী ও বৈশিষ্টের কারণে অজ্ঞ লোকেরা তাদের অস্তিত্ব ও শক্তি–সামর্থ সম্পর্কে কিছু অতিরঞ্জিত ধারণা পোষণ করে আসছিলো এমনকি তাদের পূজা করতে শুরু করেছিল। কিন্তু কুরআন তাদের ব্যাপারে প্রকৃত সত্য একেবারে খোলাসা করে বলে দিয়েছে যা থেকে তারা কি এবং কি নয় তা ভালভাবে জানা যায়।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

জিনদের একটি দল কুরআন মজীদ শোনার পর তার কি প্রভাব গ্রহণ করেছিল এবং ফিরে গিয়ে নিজ জাতির অন্যান্য জিনদের কি কি কথা বলেছিল, এ সূরার প্রথম আয়াত থেকে ১৫ আয়াত পর্যন্ত তা–ই বলা হয়েছে। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা তাদের সব কথাবার্তা এখানে উল্লেখ করেননি। বরং উল্লেখযোগ্য বিশেষ বিশেষ কথাগুলোই উল্লেখ

করেছেন। তাই বর্ণনাভঙ্গী ধারাবাহিক কথাবার্তা বলার মত নয়। বরং তাদের বিভিন্ন উক্তি এমনভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, তারা এরূপ এরূপ কথা বলেছে। জিনদের মুখ থেকে উচ্চারিত এসব উক্তি যদি মানুষ গভীর মনোযোগ সহকারে পড়ে তাহলে সহজেই একথা বুঝা যাবে যে, তাদের ঈমান আনার এ ঘটনা এবং নিজ জাতির সাথে কথোপকথন কুরআন মজীদে বিশেষ কোন উদ্দেশ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে। আয়াতের ব্যাখ্যায় আমি যে টীকা লিখেছি তাতে তাদের উক্তিসমূহের যে ব্যাখ্যা পেশ করেছি এ উদ্দেশ্য বুঝতে তা আরো অধিক সাহায্য করবে।

তারপর ১৬ থেকে ১৮ পর্যন্ত আয়াতে লোকদের বুঝানো হয়েছে যে, তারা যদি শিরক পরিত্যাগ করে এবং সঠিক পথে চলার ক্ষেত্রে অবিচল থাকে তাহলে তাদের প্রতি অজস্র নিয়ামত বর্ষিত হবে। অন্যথায় আল্লাহর পাঠানো এ উপদেশবাণী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার পরিণামে তারা কঠিন আযাবের মধ্যে নিপতিত হবে। অতপর ১৯ থেকে ২৩ পর্যন্ত আয়াতে মক্কার কাফেরদের তিরস্কার করা হয়েছে। কারণ আল্লাহর রসূল যখন আল্লাহর দিকে উচ্চকণ্ঠে আহবান জানান তখন তারা তার ওপরে হামলা করতে উদ্যত হয়। অথচ আল্লাহর বাণী পৌছিয়ে দেয়াই রসূলের দায়িত্ব। তিনি তো এ দাবী করছেন না যে, মানুষের ভালমন্দ এবং কল্যাণ ও অকল্যাণ তারই ইখতিয়ারে। এরপর ২৪ ও ২৫ আয়াতে কাফেরদের এ মর্মে হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়েছে যে, আজ তারা রসূলকে বন্ধুহীন ও অসহায় দেখে অবদমিত করে রাখার চেষ্টা করছে। কিন্তু এমন এক সময় আসবে যখন তারা জানতে পারবে, প্রকৃতপক্ষে বন্ধুহীন ও অসহায় কারা? সে সময়টি দূরে না নিকটে রসূল তা জানেন না। কিন্তু সেটি অবশ্যই আসবে। সব শেষে লোকদের জানিয়ে দেয়া হয়েছে, 'আলেমুল গায়েব' বা গায়েবী বিষয়ের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহরই আছে। রসূল শুধু ততটুকুই জানতে পারেন যতটুকু আল্লাহ তাঁকে জানান। এ জ্ঞানও হয় রিসালাতের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন সম্পর্কিত বিষয়ে। এমন সুরক্ষিত পন্থায় রসূলকে এ জ্ঞান দেয়া হয় যার মধ্যে বাইরে থেকে হস্তক্ষেপের আদৌ কোন সম্ভাবনা থাকে না।

قُلْ أُوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْٓا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ﴿١﴾
يَّهْدِيْٓ إِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ؕ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ أَحَدًا ﴿٢﴾ وَّأَنَّهُ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا
مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ﴿٣﴾ وَّأَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا ﴿٤﴾
وَّأَنَّا ظَنَنَّآ أَنْ لَّنْ تَقُوْلَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ﴿٥﴾ وَّأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ
مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا ﴿٦﴾

হে নবী, বল, আমার কাছে অহী পাঠানো হয়েছে যে, জিনদের একটি দল মনোযোগ দিয়ে শুনেছে।[১] তারপর (ফিরে গিয়ে নিজ জাতির লোকদেরকে) বলেছেঃ

"আমরা এক বিস্ময়কর 'কুরআন' শুনেছি[২] যা সত্য ও সঠিক পথের নির্দেশনা দেয় তাই আমরা তার ওপর ঈমান এনেছি এবং আমরা আর কখনো আমাদের রবের সাথে কাউকে শরীক করবো না।"[৩]

আর "আমাদের রবের মর্যাদা অতীব সমুচ্চ। তিনি কাউকে স্ত্রী কিংবা সন্তান হিসেবে গ্রহণ করেননি।"[৪]

আর "আমাদের নির্বোধ লোকেরা[৫] আল্লাহ সম্পর্কে সত্য ও ন্যায়ের পরিপন্থী অনেক কথাবার্তা বলে আসছে।"

আর "আমরা মনে করেছিলাম যে, মানুষ এবং জিন আল্লাহ সম্বন্ধে কখনো মিথ্যা বলতে পারে না।"[৬]

আর "মানুষের মধ্য থেকে কিছু লোক জিনদের কিছু লোকের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতো। এভাবে তারা জিনদের অহংকার আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।"[৭]

১. এ থেকে জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে সময় জিনদের দেখতে পাচ্ছিলেন না এবং তারা যে কুরআন শুনছে একথাও তাঁর জানা ছিল না। পরবর্তী সময়ে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে অহীর মাধ্যমে এ ঘটনা জানিয়ে দিয়েছেন। এ ঘটনাটি বর্ণনা প্রসংগে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, সে সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিনদের উদ্দেশ্যে কুরআন পাঠ করেননি এবং তিনি তাদের দেখেনওনি।" (মুসলিম, তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ, ইবনে জারীর)

২. মূল আয়াতে قُرْاٰنًا عَجَبًا শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। 'কুরআন' মানে পড়ার মত জিনিস। জিনেরা সম্ভবত শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহার করেছিল। কারণ তখন তারা প্রথম বারের মত এ বাণীর সাথে পরিচিত হয়েছিল। সে সময় হয়তো তাদের জানা ছিল না যে, যে জিনিস তারা শুনছে তার নামই কুরআন। عجب আধিক্য অর্থনির্দেশক একটি শব্দ। আরবী ভাষায় শব্দটি ব্যবহৃত হয় অত্যধিক বিস্ময়কর ব্যাপার বুঝাতে। সুতরাং জিনদের উক্তির অর্থ হলো, আমরা এমন একটি বাণী শুনে এসেছি যা ভাষাগত উৎকর্ষতা ও বিষয়বস্তু হিসেবে অতুলনীয়।

এ থেকে জানা যায় যে, জিনরা শুধু মানুষের কথা শুনতে পারে তাই নয়, তারা মানুষের ভাষাও ভালভাবে বুঝতে পারে। তবে এটা জরুরী নয় যে, সব জিন মানুষের সব ভাষাই জানবে বা বুঝবে। সম্ভবত তাদের যে গোষ্ঠী পৃথিবীর যে এলাকায় বসবাস করে তারা সে এলাকার মানুষের ভাষা জানে। তবে কুরআনের এ বক্তব্য থেকে একথা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ঐ সময় যেসব জিন কুরআন শুনেছিল তারা আরবী ভাষায় এত দক্ষ ছিল যে, তারা এ বাণীর অতুলনীয় ভাষাগত উৎকর্ষ পর্যন্ত উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিল এবং এর উচ্চমানের বিষয়বস্তুও ভালভাবে বুঝতে পেরেছিল।

৩. এ থেকে কয়েকটি বিষয় জানা গেল। এক, জিনরা আল্লাহর অস্তিত্ব এবং তাঁর 'রব' হওয়াকে অস্বীকার করে না। দুই, তাদের মধ্যেও মুশরিক আছে যারা মুশরিক মানুষের মত অন্য জিনিসকে আল্লাহর উলুহিয়াতের মধ্যে শরীক করে। তাই জিনদের যে কওমের সদস্যরা কুরআন মজীদ শোনার পর কওমের কাছে ফিরে গিয়েছিল তারাও ছিল মুশরিক। তিন, নবুওয়াত এবং আসমানী কিতাবসমূহ নাযিল হওয়ার ধারা জিনদের মধ্যে প্রচলিত ছিল না। বরং তাদের মধ্যে যেসব জিন ঈমান আনে তারা মানুষের মধ্যে প্রেরিত নবী এবং তাদের আনীত কিতাবসমূহের ওপর–ই ঈমান আনে। একথাটি সূরা আহ্‌কাফের ২৯–৩১ আয়াত থেকেও জানা যায়। ঐ আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে, সে সময় যেসব জিন কুরআন শুনেছিল তারা হযরত মূসার অনুসারী ছিল। তারা কুরআন শোনার পর নিজের কওমকে এ মর্মে দাওয়াত দিয়েছিল যে, এখন আল্লাহর পক্ষ থেকে যে বাণী এসেছে এবং পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের সত্যতা প্রতিপন্ন করছে তার ওপর ঈমান আনো। সূরা আর রাহমানও এ বিষয়টিই প্রমাণ করে। কারণ তার পুরা বক্তব্যই স্পষ্ট করে দেয় যে, মানুষ ও জিন শুধু এ দু'টি সৃষ্টিই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের ক্ষেত্র ছিল।

৪. এখান থেকে দু'টি বিষয় জানা গেল। এ জিনগুলো হয় ঈসায়ী বা খৃষ্ট ধর্মের অনুসারী ছিল অথবা অন্য এমন কোন ধর্মের অনুসারী ছিল যে ধর্মে মহান আল্লাহর স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে আছে বলে বিশ্বাস করা হতো। দুই, সে সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا ۝٧ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ۝٨ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ۖ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ۝٩ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ۝١٠ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ ۖ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا ۝١١ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا ۝١٢

আর "তোমরা যেমন ধারণা পোষণ করতে মানুষেরাও ঠিক তেমনি ধারণা পোষণ করেছিল যে, আল্লাহ কাউকে রসূল বানিয়ে পাঠাবেন না।"[৮]

আর "আমরা আসমানে অনুসন্ধান চালিয়ে দেখেছি, তা কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিণ্ড দ্বারা পরিপূর্ণ।"

আর "ইতিপূর্বে আমরা ছিটেফোটা কিছু আড়ি পেতে শোনার জন্য আসমানে বসার জায়গা পেয়ে যেতাম। কিন্তু এখন কেউ গোপনে শোনার চেষ্টা করলে সে তার নিজের বিরুদ্ধে নিক্ষেপের জন্য একটা উল্কা নিয়োজিত দেখতে পায়।"[৯]

আর আমাদের বোধগম্য হচ্ছিল না যে, পৃথিবীবাসীদের সাথে কোন খারাপ আচরণ করার সংকল্প করা হয়েছে, নাকি তাদের প্রভু, তাদেরকে সঠিক পথ দেখাতে চান?[১০]

আর আমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক আছে নেক্‌কার আর কিছু লোক আছে তার চেয়ে নীচু পর্যায়ের। এভাবে আমরা বিভিন্ন মতে বিভক্ত[১১] ছিলাম।

আর আমরা মনে করতাম যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহকে অক্ষম করে দিতে সক্ষম নই এবং পালিয়েও তাঁকে পরাভূত করতে পারবো না।[১২]

সাল্লাম নামাযের মধ্যে পবিত্র কুরআনের এমন কোন অংশ তিলাওয়াত করছিলেন যা শুনে তাদের কাছে নিজেদের আকীদার ভ্রান্তি ধরা পড়েছিল এবং তারা বুঝতে পেরেছিল যে, মহান আল্লাহর সমুন্নত ও অতি মর্যাদাবান সত্তার সাথে স্ত্রী ও ছেলেমেয়েকে সম্পর্কিত করা চরম অজ্ঞতা ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ।

৫. মূল আয়াতে سَفِيهُنَا শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এ শব্দটি এক ব্যক্তির জন্যও ব্যবহৃত হতে পারে আবার অনেক লোক বা দলের জন্যও ব্যবহৃত হতে পারে। যদি শব্দটি একজন অজ্ঞ বা মূর্খ লোক অর্থে গ্রহণ করা হয় তাহলে তার মানে হবে ইবলীস। আর যদি

অনেক লোক বা দল অর্থে গ্রহণ করা হয় তাহলে তার অর্থ হবে জিনদের মধ্য থেকে অনেক নির্বোধ ও বুদ্ধি–বিবেকহীন লোক এ রকম কথা বলতো।

৬. অর্থাৎ তাদের ভ্রান্ত কথাবার্তা দ্বারা আমাদের বিভ্রান্ত হওয়ার কারণ হলো, আমরা কোন সময় চিন্তাও করতে পারিনি যে, মানুষ কিংবা জিন আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলার দুঃসাহসও করতে পারে। কিন্তু এখন এ কুরআন শুনে আমরা জানতে পেরেছি যে, প্রকৃত–পক্ষে তারা ছিল মিথ্যাবাদী।

৭. ইবনে আব্বাস বলেন ঃ জাহেলী যুগে আরবরা যখন কোন জনহীন প্রান্তরে রাত্রি যাপন করতো তখন উচ্চস্বরে বলতো, "আমরা এ প্রান্তরের অধিপতি জিনের আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'' জাহেলী যুগের অন্যান্য বর্ণনাতেও এ বিষয়টির বহুল উল্লেখ দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ, কোন জায়গার পানি এবং ঘাস ফুরিয়ে গেলে মরুচারী যাযাবর বেদুইনরা তাদের একজন লোককে এমন আরেকটি জায়গা খুঁজে বের করতে পাঠাতো যেখানে পানি এবং ঘাস পাওয়া যেতে পারে। অতপর উক্ত ব্যক্তির নির্দেশনা মুতাবিক এসব লোক নতুন জায়গায় পৌঁছলে সেখানে অবস্থান নেয়ার আগে চিৎকার করে বলতো ঃ আমরা এ প্রান্তরের মালিকের আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যাতে আমরা এখানে সব রকম বিপদ থেকে নিরাপদ থাকতে পারি।" তাদের বিশ্বাস ছিল, প্রত্যেক জনমানবহীন জায়গা কোন না কোন জিনের দখলে আছে। তার আশ্রয় প্রার্থনা ছাড়াই কেউ যদি সেখানে অবস্থান করে তাহলে সে জিন হয় নিজেই তাদের উত্যক্ত করে কিংবা অন্য জিনদের উত্যক্ত করার জন্য লেলিয়ে দেয়। ঈমান আনয়নকারী এ জিনরা এ বিষয়টির প্রতিই ইংগিত করেছে। তাদের কথার অর্থ হলো এ পৃথিবীর খলীফা বা প্রতিনিধি মানুষ। তারাই যখন উল্টা আমাদের ভয় করতে শুরু করেছে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমাদের কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করতে শুরু করেছে তখন আমাদের জাতির লোকদের মস্তিষ্ক বিকৃতি আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের গর্ব, অহংকার এবং কুফরী ও জুলুম অত্যাচারের মাত্রা অত্যধিক বেড়ে গিয়েছে এবং গোমরাহীর ক্ষেত্রে তারা আরো বেপরোয়া হয়ে গিয়েছে।

৮. মূল ভাষ্য হচ্ছে اَنْ لَّنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا এ আয়াতাংশের দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি আমরা যা অনুবাদ করেছি। অপরটি হলো, "মৃত্যুর পর আল্লাহ তা'আলা কাউকে আর জীবিত করে উঠাবেন না।" যেহেতু কথাটি ব্যাপক অর্থবোধক তাই তার এ অর্থও গ্রহণ করা যেতে পারে যে, মানুষের মত জিনদের মধ্যে একদল আখেরাতকে অস্বীকার করতো। কিন্তু পরবর্তী বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যের দিক থেকে প্রথম অর্থটিই অধিক অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। কারণ, পরবর্তী আয়াতসমূহে এ বিষয়টির উল্লেখ আছে যে, ঈমান আনয়নকারী এসব জিন তাদের কওমকে বলছে, আল্লাহ আর কোন রসূল পাঠাবেন না। তোমাদের এ ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের জন্য আসমানের দরজা বন্ধ করার কারণ হলো আল্লাহ একজন রসূল পাঠিয়েছেন।

৯. এটাই সে কারণ যার ভিত্তিতে জিনরা এ বিষয়টি অনুসন্ধান করতে বেরিয়েছিল যে, পৃথিবীতে এমন কি ঘটনা ঘটেছে বা ঘটতে যাচ্ছে যার খবরাখবর সুরক্ষিত করার জন্য এমন কঠোর ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে এখন আমরা উর্ধ জগতের কোন খবর জানার সুযোগ পাই না এবং যেখানেই যাই আমাদের মেরে তাড়িয়ে দেয়া হয়।

وَّاَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدٰۤى اٰمَنَّا بِهٖ ؕ فَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِرَبِّهٖ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا
وَّلَا رَهَقًا ﴿١٣﴾ وَّاَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ وَمِنَّا الْقٰسِطُوْنَ ؕ فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُولٰٓئِكَ تَحَرَّوْا
رَشَدًا ﴿١٤﴾ وَاَمَّا الْقٰسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿١٥﴾ وَّاَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوْا عَلَى
الطَّرِيْقَةِ لَاَسْقَيْنٰهُمْ مَّآءً غَدَقًا ﴿١٦﴾ لِّنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ؕ وَمَنْ يُّعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهٖ
يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿١٧﴾ وَّاَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا ﴿١٨﴾
وَّاَنَّهٗ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿١٩﴾

আর আমরা যখন হিদায়াতের বাণী শুনলাম তখন তার প্রতি ঈমান আনলাম। যে ব্যক্তিই তার রবের ওপর ঈমান আনবে তার অধিকার বিনষ্ট হওয়ার কিংবা অত্যাচারিত হওয়ার ভয় থাকবে না।[১৩]

আর আমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক আছে মুসলমান (আল্লাহর আনুগত্যকারী) আর কিছু সংখ্যক আছে ন্যায় ও সত্য থেকে বিমুখ। তবে যারা ইসলাম (আনুগত্যের পথ) গ্রহণ করেছে তারা মুক্তির পথ খুঁজে পেতে সক্ষম হয়েছে। আর যারা ন্যায় ও সত্য থেকে বিমুখ তারা হবে জাহান্নামের ইন্ধন।[১৪]

আর[১৫] *(হে নবী, বলে দাও, আমাকে অহীর মাধ্যমে এও জানানো হয়েছে যে,) লোকেরা যদি সঠিক পথের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকতো তাহলে আমি তাদের প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করতাম।*[১৬] *যাতে এ নিয়ামতের মাধ্যমে তাদের পরীক্ষা করতে পারি।*[১৭] *আর যারা তাদের প্রভুর স্মরণ থেকে বিমুখ হবে*[১৮] *তিনি তাদের কঠিন আযাবে নিক্ষেপ করবেন। আর মসজিদসমূহ আল্লাহর জন্য। তাই তোমরা আল্লাহর সাথে আর কাউকে ডেকো না।*[১৯] *আর আল্লাহর বান্দা*[২০] *যখন তাঁকে ডাকার জন্য দাঁড়ালো তখন তারা সবাই তার ওপর হামলা করতে উদ্যত হলো।*

১০. এ থেকে জানা গেল যে, দু'টি পরিস্থিতিতে উর্ধ জগতে এ ধরনের অসাধারণ ব্যবস্থাদি গৃহীত হয়ে থাকে। এক, আল্লাহ যদি পৃথিবীবাসীদের ওপর কোন আযাব নাযিল করার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন এবং চান যে, তা নাযিল হওয়ার আগে জিনরা তার পূর্বাভাস পেয়ে তাদের মানুষ বন্ধুদের সাবধান করে না দিক। দুই, আল্লাহ যদি পৃথিবীতে কোন রসূল পাঠিয়ে থাকেন এবং তাঁর কাছে যেসব হিদায়াত ও বাণী পাঠানো হচ্ছে তাতে শয়তানরা

যাতে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করতে না পারে এবং রসূলের কাছে কি কি হিদায়াত বা বাণী পাঠানো হচ্ছে তা আগেভাগেই জেনে নিতে না পারে তার নিরাপত্তা ও সংরক্ষণ কাম্য হয় তখন এ ধরনের অসাধারণ ব্যবস্থাদি গৃহীত হয়। সুতরাং জিনদের একথাটির অর্থ হলো, আমরা যখন আসমানে এরূপ কঠোর প্রহরা দেখলাম এবং অজস্র উল্কা বর্ষণ লক্ষ করলাম তখন এ দু'টি অবস্থার কোন্‌টি সংঘটিত হচ্ছে আমাদের মধ্যে তা জানার উদ্বেগ সৃষ্টি হলো। আল্লাহ তা'আলা কি হঠাৎ করে পৃথিবীর কোন জাতির ওপর আযাব নাযিল করেছেন না কোন এলাকায় কোন রসূল পাঠিয়েছেন? এ বিষয়টি অনুসন্ধানেই আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম। এরি এক পর্যায়ে আমরা এ বিস্ময়কর বাণী শুনতে পেলাম যা সত্য ও সঠিক পথের সন্ধান দান করে। এভাবে আমরা জানতে পেরেছি, আল্লাহ কোন আযাব নাযিল করেননি। বরং তাঁর সৃষ্টিকে সত্য ও সঠিক পথ দেখানোর জন্য একজন রসূল পাঠিয়েছেন। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল হিজ্‌র, টীকা ৮ থেকে ১২; সূরা সাফ্‌ফাত, টীকা ৭ এবং সূরা আল মুলক্‌, টীকা ১১)

১১. অর্থাৎ আমাদের মধ্যে নৈতিক চরিত্রের দিক থেকেও ভাল ও মন্দ দু' প্রকারের জিন আছে এবং আকীদা-বিশ্বাসের দিক থেকেও মত ও পথ একটি নয়। এ ক্ষেত্রেও আমরা বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত। একথা বলে ঈমান আনয়নকারী এসব জিন নিজ জাতির জিনদের বুঝাতে চাচ্ছিল যে, নিসন্দেহে আমরা সত্য ও সঠিক পথ খুঁজে বের করার মুখাপেক্ষী। এর প্রয়োজনীয়তা আমরা অস্বীকার করতে পারি না।

১২. অর্থাৎ আমাদের এ ধারণাই আমাদের মুক্তির পথ দেখিয়েছে। আমরা যেহেতু আল্লাহ সম্পর্কে নির্ভয় বা বেপরোয়া ছিলাম না এবং এ ব্যাপারে আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে, যদি আমরা তাঁর অবাধ্য হই তাহলে তাঁর পাকড়াও থেকে কোন অবস্থায়ই বাঁচতে পারবো না। তাই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত সত্য ও সঠিক পথ প্রদর্শনকারী বাণী শুনে ন্যায় ও সত্যকে জানার পরও অজ্ঞ ও নির্বোধ লোকদের প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত আকীদা-বিশ্বাসকেই আঁকড়ে থাকার দুঃসাহস আমরা দেখাইনি।

১৩. অধিকার বিনষ্ট হওয়ার অর্থ হলো, নেক কাজের জন্য যতটা পারিশ্রমিক বা পুরস্কার পাওয়ার কথা তার চাইতে কম দেয়া। আর জুলুম বা অত্যাচার হলো নেক কাজের জন্য আদৌ কোন পারিশ্রমিক বা পুরস্কার না দেয়া এবং তার দ্বারা যে ত্রুটি বা অপরাধ হয়েছে তার তুলনায় অধিক শাস্তি দেয়া, কিংবা অপরাধ ছাড়াই কাউকে শাস্তি দেয়া। আল্লাহ তা'আলার দরবারে কোন ঈমানদারের প্রতি এ ধরনের কোন বেইনসাফী হওয়ার আশংকা থাকবে না।

১৪. কুরআনের ভাষ্য অনুসারে জিনেরা আগুন থেকে সৃষ্ট। তাই প্রশ্ন হতে পারে যে, জাহান্নামের আগুন দ্বারা তাদের আবার কি কষ্ট হবে? এর জবাব হলো, কুরআনের ভাষ্য অনুসারে মানুষও মাটি থেকে সৃষ্ট। তা সত্ত্বেও তাদের মাটির ঢিল ছুঁড়ে মারলে ব্যথা পায় কেন? প্রকৃত সত্য হলো মানুষের গোটা দেহ মাটির উপাদান দ্বারা তৈরী হলেও এসব উপাদান থেকে যখন একজন রক্ত-মাংসের জীবন্ত মানুষ অস্তিত্ব লাভ করে তখন সে এসব উপাদান থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিসে রূপান্তরিত হয় এবং একই উপাদান থেকে তৈরী অন্যান্য জিনিস তার কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ঠিক তেমনিভাবে গঠনাকৃতির দিক থেকে জিন যদিও আগুনের তৈরী। কিন্তু আগুন থেকে তৈরী একটি জীবন্ত ও চেতনা সম্পন্ন

قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ⑳ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ㉑ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ㉒ إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ ۚ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ㉓ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ㉔

২ রুকূ'

হে নবী, বলো, "আমি শুধু আমার রবকেই ডাকি এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করি না।"[২১] বলো, "আমি তোমাদের কোন ক্ষতি করারও ক্ষমতা রাখি না, উপকার করারও না। বলো, আল্লাহর পাকড়াও থেকে কেউ আমাকে বাঁচাতে সক্ষম নয় এবং তাঁর কাছে ছাড়া কোন আশ্রয়ও আমি পাব না। আল্লাহর বাণী ও হুকুম–আহকাম পৌছিয়ে দেয়া ছাড়া আমার কাজ আর কিছুই নয়।[২২] এরপর যারাই আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কথা অমান্য করবে তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। এ ধরনের লোকেরা চিরকাল সেখানে থাকবে।[২৩]

(এসব লোক তাদের এ আচরণ থেকে বিরত হবে না) এমনকি অবশেষে যখন তারা সে জিনিসটি দেখবে যার প্রতিশ্রুতি তাদের দেয়া হচ্ছে, তখন তারা জানতে পারবে যে, কার সাহায্যকারী দুর্বল এবং কার দল সংখ্যায় কম।[২৪] .

সৃষ্টি যখন অস্তিত্ব লাভ করে তখন সে আগুনই তার জন্যে কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আর রাহমান, টীক ১৫)

১৫. এর পূর্বে জিনদের কথা শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন এখান থেকে আল্লাহ তা'আলার নিজের কথা শুরু হচ্ছে।

১৬. একথাটিই সূরা নূহে এভাবে বলা হয়েছে, "তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি তোমাদের ওপর আসমান থেকে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন।" (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা নূহ, টীকা ২) প্রচুর পরিমাণ পানিকে নিয়ামতের প্রাচুর্য অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, পানির ওপর নির্ভর করেই জনবসতি গড়ে ওঠে। পানি না থাকলে আদৌ কোন জনপদ গড়ে উঠতে পারে না। পানি না থাকলে মানুষের মৌলিক প্রয়োজন যেমন পূরণ হয় না তেমনি মানুষের বিভিন্ন রকম শিল্পও গড়ে উঠতে পারে না।

১৭. অর্থাৎ তিনি দেখতে চান তারা নিয়ামতলাভ করার পর কৃতজ্ঞ থাকে কিনা এবং আমার দেয়া নিয়ামতসমূহ সঠিকভাবে কাজে লাগায়, না ভ্রান্ত পথে কাজে লাগায়।

১৮. স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার একটা অর্থ হলো, মানুষ আল্লাহর প্রেরিত উপদেশ গ্রহণ করবে না। আরেকটা অর্থ হলো, মানুষ আল্লাহর যিকরের কথা শোনা পছন্দই করবে না। এর আরেকটি অর্থ হলো, সে আল্লাহর ইবাদাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে।

১৯. মুফাস্‌সিরগণ مَسَاجِد শব্দটি সাধারণভাবে ইবাদাতখানা বা উপাসনালয় অর্থে গ্রহণ করেছেন ঃ 'মাসাজিদ' শব্দটির এ অর্থ গ্রহণ করলে আয়াতটির অর্থ হয় 'উপাসনালয় সমূহে আল্লাহর ইবাদাতের সাথে সাথে আর কারো ইবাদাত যেন করা না হয়। হযরত হাসান বাস্‌রী বলেন ঃ সমস্ত পৃথিবীটাই ইবাদাতখানা বা উপাসনালয়। তাই আয়াতটির মূল বক্তব্য হলো আল্লাহর এ পৃথিবীতে কোথাও যেন শির্‌ক করা না হয়। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বাণী থেকে প্রমাণ পেশ করেছেন وَجُعِلَتْ لِىَ الْاَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا আমার জন্য সমগ্র পৃথিবীকে ইবাদাতের স্থান এবং পবিত্রতা অর্জনের উপায় বানিয়ে দেয়া হয়েছে। হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর মসজিদ বলতে যেসব অংগ–প্রত্যংগের সাহায্যে মানুষ সিজদা করে সেগুলো অর্থাৎ হাত, হাঁটু, পা ও কপাল বুঝিয়েছেন। এ ব্যাখ্যা অনুসারে আয়াতটির অর্থ হলো, সমস্ত অংগ–প্রত্যংগ আল্লাহর তৈরী। এগুলোর সাহায্যে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে সিজদা করা যাবে না।

২০. এখানে আল্লাহর বান্দা অর্থ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

২১. অর্থাৎ আল্লাহকে ডাকা এমন কোন আপত্তিকর কাজ নয় যার জন্য মানুষ এতটা রাগান্বিত ও উত্তেজিত হয়ে পড়বে। তবে কেউ যদি আল্লাহর সাথে তাঁর প্রভুত্ব ও উলুহিয়্যাতের ব্যাপারে কাউকে শরীক করে তাহলে তা নিসন্দেহে খারাপ। আর এ কাজ আমি করিনি। বরং যারা আল্লাহর নাম শুনে আমার ওপর হামলা করতে চায় তারাই এ কাজ করছে।

২২. অর্থাৎ আমি কখনো এ দাবী করি না যে, আল্লাহর প্রভূত্বে আমার কোন দখলদারী বা কর্তৃত্ব আছে। কিংবা মানুষের ভাগ্য ভাঙা বা গড়ার ব্যাপারে আমার কোন ক্ষমতা আছে। আমি তো আল্লাহর একজন রসূল মাত্র। আমার ওপর যে কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে তা তোমাদের কাছে আল্লাহ তা'আলার বাণী পৌঁছিয়ে দেয়ার অধিক আর কিছুই নয়। আল্লাহর ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের ব্যাপার তো পুরোপুরি আল্লাহরই করায়ত্ব। অন্য কারো কল্যাণ বা ক্ষতি সাধন তো দূরের কথা নিজের ক্ষতি ও কল্যাণের ব্যাপারটিও আমার নিজের ইচ্ছাধীন নয়। আমি যদি আল্লাহর নাফরমানী করি তাহলে তাঁর পাকড়াও থেকে আত্মরক্ষা করে কোথাও আশ্রয় লাভ করতে পারবো না। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কাছে ছাড়া আমার আর কোন আশ্রয়স্থল নেই। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আশ্‌ শূরা, টীকা ৭)

২৩. এর অর্থ এই নয় যে, প্রতিটি গোনাহ ও অপরাধের শাস্তিই হচ্ছে চিরস্থায়ী জাহান্নাম। বরং যে প্রসংগে একথাটি বলা হয়েছে তার আলোকে আয়াতের অর্থ হলো আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে তাওহীদের যে আহবান জানানো হয়েছে তা যে ব্যক্তি

قُلْ إِنْ أَدْرِىٓ أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُۥ رَبِّىٓ أَمَدًا ﴿٢٥﴾ عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ
فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِۦٓ أَحَدًا ﴿٢٦﴾ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُۥ يَسْلُكُ
مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِۦ رَصَدًا ﴿٢٧﴾ لِّيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا۟ رِسَٰلَٰتِ
رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَىْءٍ عَدَدًۢا ﴿٢٨﴾

বলো, আমি জানি না, যে জিনিসের প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেয়া হচ্ছে তা নিকটে, না তার জন্য আমার রব কোন দীর্ঘ মেয়াদ স্থির করছেন।[২৫] তিনি গায়েবী বিষয়ে জ্ঞানের অধিকারী। তিনি তাঁর গায়েবী বিষয়ের জ্ঞান কারো কাছে প্রকাশ করেন না।[২৬] তবে যে রসূলকে (গায়েবী বিষয়ের কোন জ্ঞান দেয়ার জন্য) মনোনীত করেছেন[২৭] তাকে ছাড়া। তিনি তার সামনে ও পেছনে প্রহরী নিয়োজিত করেন।[২৮] যাতে তিনি নিশ্চিতরূপে জানতে পারেন যে, রসূলগণ তাদের রবের বাণীসমূহ পৌঁছিয়ে দিয়েছেন[২৯] তিনি তাদের গোটা পরিবেশ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত। আর তিনি প্রতিটি জিনিস গুণে গুণে হিসেব করে রেখেছেন।[৩০]

মানবে না এবং শির্ককেও বর্জন করবে না তার জন্য অবধারিত আছে জাহান্নামের চিরস্থায়ী শাস্তি।

২৪. এ আয়াতটির পটভূমি হলো, সে যুগে যেসব লোক আল্লাহর পথের দিকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আহবান শুনেই তাঁর ওপর মারমুখী হতো তারা এ খোশ খেয়ালে নিমগ্ন ছিল যে, তাদের দলবলই বড়। অপরদিকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আছে আঙুলে গোণা কয়েকজন লোক। সুতরাং তারা অতি সহজেই তাকে পরাভূত করতে সক্ষম হবে। তাই বলা হচ্ছে, আজ এসব লোক রসূলকে (স) অসহায় ও বন্ধুহীন এবং নিজেদের সংখ্যাধিক্য দেখে ন্যায় ও সত্যের কন্ঠ স্তব্ধ করে দিতে দুঃসাহস দেখাচ্ছে। কিন্তু যে সময় সম্পর্কে তাদের সাবধান করে দেয়া হচ্ছে সে দুঃসময়টি যখন আসবে, তখন তারা বুঝতে পারবে প্রকৃত পক্ষে অসহায় ও বন্ধুহীন কারা।

২৫. বর্ণনাভঙ্গী থেকেই বুঝা যায়, এটি একটি প্রশ্নের জওয়াব। এখানে প্রশ্নটি উল্লেখ না করে শুধু তার জবাব দেয়া হয়েছে। সম্ভবত ওপরে উল্লেখিত কথা শুনে বিরোধীরা বিদ্রূপের ভঙ্গীতে প্রশ্ন করে থাকবে যে, যে সময়ের ভয় তিনি দেখাচ্ছেন সে সময়টি কখন আসবে? তার জবাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তাদের বলো, সে সময়টির আগমন তো নিশ্চিত, তবে তার আগমনের দিনক্ষণ আমাকে জানানো হয়নি। সে সময়টি অতি আসন্ন, না তার জন্য দীর্ঘ সময় নির্দিষ্ট রয়েছে তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন।

২৬. অর্থাৎ গায়েবী বিষয়ের সবটুকু জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। গায়েবী বিষয়ের এ পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান তিনি কাউকেই দেন না।

২৭. অর্থাৎ রসূল নিজে 'আলেমুল গায়েব' বা গায়েবী বিষয়ে জ্ঞানের অধিকারী নন। বরং আল্লাহ তা'আলা যখন তাকে রিসালাতের দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ার জন্য মনোনীত করেন তখন তিনি ইচ্ছামত তাঁকে অদৃশ্য বস্তুসমূহের জ্ঞান দান করেন।

২৮. প্রহরী মানে ফেরেশতা। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যখন অহীর মাধ্যমে গায়েবী বিষয়ের গভীর জ্ঞান ও তাৎপর্য তাঁর রসূলের কাছে পাঠান তখন তার রক্ষণাবেক্ষণ ও পাহারাদারীর জন্য সবখানে ফেরেশতা মোতায়েন করেন। যাতে সে জ্ঞানটি অত্যন্ত সুরক্ষিত পন্থায় রসূলের কাছে পৌছতে পারে এবং তার মধ্যে বাইরের কোন কিছু সংমিশ্রিত হতে না পারে। ওপরে ৮ ও ৯নং আয়াতে একথাটিই বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত প্রাপ্তির পর জিনরা দেখলো তাদের উর্ধ জগতে প্রবেশের সব পথ বন্ধ। তারা দেখলো সব জায়গায় কঠোর প্রহরা বসানো হয়েছে যার কারণে ছিটে ফোঁটা কিছু আভাস লাভের সুযোগও তাদের নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

২৯. এর তিনটি অর্থ হতে পারে। এক, রসূল নিশ্চিতভাবে জানবেন যে, ফেশেতারা তাঁর কাছে আল্লাহ তা'আলার বাণীসমূহ ঠিক ঠিক পৌছিয়ে দিয়েছে। দুই, আল্লাহ তা'আলা জানবেন যে, ফেরেশতারা তাদের রবের বাণীসমূহ তাঁর রসূলের কাছে সঠিকভাবে পৌছিয়ে দিয়েছে। তিন, আল্লাহ তা'আলা জানবেন যে, রসূলগণ তাঁদের রবের বাণীসমূহ তাঁর বান্দাদের কাছে ঠিকমত পৌছিয়ে দিয়েছেন। আয়াতটির শব্দমালা এ তিনটি অর্থেরই ধারক। অসম্ভব নয় যে, এখানে যুগপৎ এ তিনটি অর্থই বুঝানো হয়েছে। এ ছাড়াও আয়াতটির আরো দু'টি অর্থ হয়। প্রথমটি হলো রিসালাতের দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ার জন্য রসূলকে যতটুকু 'ইলমে গায়েব' বা অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান দান করা জরুরী ততটুকু জ্ঞান দান করা। দ্বিতীয়টি হলো, যেসব ফেরেশতাকে প্রহরা কাজে নিয়োজিত করা হয় তারা রসূল পর্যন্ত সুরক্ষিত পন্থায় অহী পৌছে যাওয়ার ব্যাপারটুকুই শুধু তত্বাবধান করেন না বরং রসূল তাঁর রবের বাণীসমূহ তাঁর বান্দাদের কাছে যাতে পুরোপুরি পৌছিয়ে দিতে পারেন তার তত্বাবধানও করে থাকেন।

৩০. অর্থাৎ আল্লাহর ক্ষমতা রসূল ও ফেরেশতা উভয়কে এমনভাবে পরিব্যাপ্ত করে আছে যে, তারা যদি তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে চুল পরিমাণ কাজও করেন তাহলে সংগে সংগে পাকড়াও হবেন। আর যে বাণীসমূহ আল্লাহ পাঠান তার প্রতিটি বর্ণ গোণা ও হিসেব করা। তার একটি বর্ণের হ্রাস–বৃদ্ধি করার ক্ষমতাও রসূল বা ফেরেশতা কারো নেই।